বাংলাদেশের শোলাশিল্প : নকশা ও ঐতিহ্য সন্ধান

জাকিয়া আহমেদ ঝুমা*

সারসংক্ষেপ : *বাংলাদেশের বৈচিত্র্যময় লোকশিল্পের ভান্ডারে অন্যতম একটি উপাদান শোলাশিল্প। শোলা এক প্রকার উদ্ভিদ-যা থেকে শিল্পকর্ম প্রস্তুত করা হয়। আর্থসামাজিক ও বৈশ্বিক প্রেক্ষিতে এক সময় এই শিল্পের ব্যবহার অধিক ছিল, কিন্তু বর্তমানে উপকরণের দুস্প্রাপ্যতা, বিদেশি পণ্যের বাজার দখল এবং সাধারণ্যে পরিচিতির অভাবে এর ব্যবহার ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে শোলাশিল্পকে সংরক্ষণ ও সুরক্ষার তাগিদ অনুভব করা যায়। এই লক্ষ্যে উপকরণ, ব্যবহারিক ক্ষেত্র, করণকৌশল, সৌন্দর্য ও নান্দনিকতা ইত্যাদি অনুধাবনের প্রয়োজন। তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই নিবন্ধে শোলাশিল্পের ঐতিহ্য অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে। ঐতিহ্য অনুসন্ধান করতে গিয়ে শোলাশিল্পের বিভিন্ন দিক যেমন–লোকশিল্প হিসেবে শোলাশিল্প, কারুশিল্প হিসেবে শোলাশিল্প, শোলাশিল্পের ধর্মীয় গুরুত্ব, খেলনা হিসেবে শোলাশিল্প ইত্যাদি বিষয়সমূহ অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।*

১. ভূমিকা

সভ্যতা বিকাশের পূর্বে মানুষ যখন গুহায় বসবাস করত তখন থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত নানা ধরনের শিল্পচর্চা করে আসছে। সভ্যতার উপাদান হিসেবে স্বতঃস্ফূর্ত শিল্পকর্ম, বিশ্বাসভিত্তিক প্রথা, অলংকরণ ও সজ্জিতকরণ, কমিউনিকেশন, এসব কারণে মানুষ শিল্প সৃষ্টি করত। যে কোনো শিল্পীর কাছে তার শিল্পকর্মই শ্রেষ্ঠ। বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে আছে নানা রকম কারুকার্যময় লোকশিল্প। আবহমান বাংলার লোকশিল্প টিকে আছে তার নিজস্ব স্বকীয়তা ও কারুকার্যময় আকর্ষণীয় নকশা এবং

*প্রভাষক, শিল্পকলা ও সৃজনশীল শিক্ষা বিভাগ, বাংলাদেশ গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ, গ্রীনরোড, ঢাকা।

রঙের কারণে। বিভিন্ন সংস্কৃতিতে, সভ্যতায়, নকশা তার বৈশিষ্ট্য নিয়ে মানব জাতির দৈনন্দিন জীবনের উপকরণে সংযুক্ত হয়েছে। লোকশিল্পের অন্তর্গত শোলাশিল্প এমন একটি শিল্প যা তার মাধ্যমগত ও বৈচিত্র্যময় নকশার কারণে এবং মালাকারদের উদ্ভাবনী ক্ষমতার জন্য আজও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে টিকে আছে। গ্রামীণ স্বল্পশিক্ষিত লোকশিল্পীদের সহজ সাবলীল জ্ঞান ও দক্ষতাকে পুঁজি করেই নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে এই শিল্প অনেকদূর অগ্রসর হয়েছে। শোলা দিয়ে শিল্পকর্ম তৈরি করা একটি সৃষ্টিশীল কাজ, যার আছে নিজস্ব নান্দনিক সৌন্দর্য। সবচেয়ে বড় কথা শোলাশিল্প একটি পরিবেশবান্ধব শিল্প, যা তার রং ও নকশার বৈশিষ্ট্যের কারণে খুব সহজেই যে কারো নজর কাড়ে। প্রাগৈতিহাসিক মানুষ যে আদিম শিল্পের স্বাক্ষর রেখেছিল–আদিম কৃষি সমাজ বর্তমানেও তা বহন করে চলেছে। লোকায়ত সমাজের দৈনন্দিন প্রয়োজন, বিশ্বাস-সংস্কার, আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদির অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে সৃষ্টি করে চলেছে লোকশিল্প, যা ছড়িয়ে আছে বাংলাদেশের সর্বত্রই। আদিপর্বে বাংলার এই শিল্পধারা ও তার সঙ্গে সম্পৃক্ত শিল্পীদের অবস্থার কথা অনেকাংশে আজও অজানা রয়ে গেছে। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও লোকশিল্প গবেষক তোফায়েল আহমেদের ভাষায়, "লোকশিল্প সাধারণ লোকের জন্য সাধারণ লোকের সৃষ্টি"[১]। গ্রামীণ সনাতন কৃষি-নির্ভর স্বল্প আয়ের মানুষের শিল্প লোকশিল্প। লোকশিল্পের একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ শোলাশিল্প। শোলাশিল্প আমাদের বাংলার ঐতিহ্য। বাংলাদেশের এই ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে।

শোলা এক ধরনের জলজ উদ্ভিদ। বাংলাদেশের খাল-বিল, পানিতে আবাদ করা ধানখেত, পাটখেত, অগভীর পুকুরের ধারে নিজে থেকেই শোলা জন্মে। এই শোলা দিয়ে শোলাশিল্পীরা নানা ধরনের লোকজ খেলনাসহ বিভিন্ন শৌখিন শিল্পসামগ্রী তৈরি করেন। এখনো গ্রামগঞ্জের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে অনেক শোলাশিল্পী। যারা শোলার শিল্পকর্ম প্রস্তুত করে তাদেরকে মালাকার বলা হয়ে থাকে।

এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে–বাংলাদেশের শোলাশিল্পের ঐতিহ্য অনুসন্ধান করা। এছাড়া আরও কিছু উদ্দেশ্য প্রতিফলিত হয়েছে, যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

- লোকশিল্পের একটা বিশাল অংশ জুড়ে রয়েছে শোলাশিল্প। তাই এই বিষয়ে একটি গভীর অনুসন্ধান প্রয়োজন।

- বিভিন্ন লোকশিল্পের সাথে শোলাশিল্পের গঠনগত মিল নির্ণয় করা।
- শোলাশিল্প কেন বিলুপ্তির পথে তার কারণ খুঁজে বের করা।
- শোলাশিল্পের স্থায়িত্ব কম–এই বিষয় অনুসন্ধান করা।

গবেষণার বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে শোলাশিল্পকে বেছে নেয়ার কিছু যৌক্তিক কারণ হচ্ছে–আমাদের সংস্কৃতি থেকে শোলাশিল্প বিলুপ্ত হওয়া এবং এ বিষয়ে সাধারণ মানুষের কোনো ধারণা না থাকা। শোলাশিল্প বিলুপ্ত হবার কারণ–উচ্চমূল্য এবং মেলা বা হাটবাজারে স্বল্পমূল্যে প্লাস্টিক ও বিদেশি জিনিসের সহজলভ্যতা। লোকশিল্পের মধ্যে নকশিপাখা, ছিকা, শখের হাঁড়ি, কারুকাজ খচিত তামা, কাঁসা ইত্যাদি সব বিষয়েই সাধারণ মানুষের কিছু ধারণা থাকলেও শোলাশিল্প সম্পর্কে অনেকেরই ধারণা কম। আর সে কারণেই শোলাশিল্পের মৌলিক গুণাবলি ও এর আকর্ষণীয় শৈল্পিক গুরুত্ব প্রকাশের জন্যই এ বিষয়টি নির্বাচন করা হয়েছে।

১.১ শোলাশিল্পের আদিকথা

প্রাচীনকালে সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে শিল্পকলা। সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সভ্যতার অনেক উপাদানই ধ্বংস হয়ে গেছে, টিকে আছে শুধু শিল্পকর্ম। হাজার বছরের শিল্পের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়–শিল্পের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কখনো এক জায়গায় স্থির থাকেনি, যুগে যুগে তা পরিবর্তিত হয়েছে। আদিম যুগে মানুষ শিল্প সৃষ্টি করত এক ধরনের টোটেম, টাবু ও জাদু বিশ্বাস থেকে। শিকারি যুগে মানুষ নানা ধরনের জীবজন্তুর ছবি আঁকত শিকারে সফল হওয়ার জন্য। সুতরাং বলা যায় যে, শিল্প ছিল আদিম মানুষের বেঁচে থাকার সংগ্রামের হাতিয়ার। পরবর্তীকালে বুদ্ধিবৃত্তির কিছুটা উন্নত স্তরে মানব সমাজে ধর্মের আবির্ভাব ঘটল এবং সেসময় থেকেই শিল্প ধর্মাশ্রয়ী হয়ে উঠল। পরবর্তীসময়ে দীর্ঘকাল পর্যন্ত পৃথিবী ধর্মভিত্তিক শিল্প দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে থাকল। পৃথিবীর সর্বত্রই তখন ধর্মভিত্তিক শিল্পের জয়জয়কার। সেই সময় শিল্প কখনো হিন্দু আর্ট, কখনো মুসলিম আর্ট, কখনো বুদ্ধিস্ট আর্ট কখনো-বা খ্রিষ্টান আর্টকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে।

বাংলাদেশের শিল্পকলার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় শিল্পকলার একটা বিশাল অংশ জুড়ে রয়েছে লোকশিল্প। বাংলাদেশের লোকজীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ এই লোকশিল্প। কিছু কিছু লোকশিল্পও শুরুতে ধর্মকেন্দ্রিক হয়ে গড়ে ওঠে। পরবর্তীকালে সামাজিক বিকাশ ঘটার সাথে সাথে লোকশিল্প ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়ে। বাংলাদেশের লোকশিল্পের ভুবনে অনেকটা জায়গা জুড়ে রয়েছে শোলাশিল্প। শোলাশিল্পের ইতিহাস সম্পর্কে একটি কিংবদন্তি প্রচলিত আছে।

হিন্দু পুরাণে বর্ণিত আছে–স্বয়ং শিব হিমালয়-কন্যা পার্বতীকে বিবাহ করার সময় বিবাহোৎসবে ধবধবে সাদা মুকুট ও মালা পরার ইচ্ছা পোষণ করেন। কিন্তু প্রভু বিশ্বকর্মা যিনি সনাতন ধর্মমতে কারুশিল্পীদের স্রষ্টা তিনি জানতেন না যে, কী উপাদানে এই শুভ্র ধবল মুকুট ও মালা তৈরি করা যাবে। তাই শিব তার মাথার একগুচ্ছ চুল তুলে পুকুরের পানিতে ফেলে দেন। এরপর সেখান থেকে পানিতে গুল্ম জাতীয় এক প্রকার উদ্ভিদ জন্মে যা ভাত শোলা নামে পরিচিত। এরপর বিশ্বকর্মা আবার দ্বিধান্বিত হলেন এই ভেবে যে, তিনি নরম, হালকা ও ভঙ্গুর উপাদান দিয়ে কীভাবে মুকুট ও মালা তৈরি করবেন। কারণ বিশ্বকর্মা শুধু পাথর বা কাঠের মতো শক্ত দ্রব্যে কাজ করতে পারদর্শী। তখন আবার শিব তার হাতের বাহু থেকে একগুচ্ছ চুল তুলে তা পানিতে ফেলে দেন এবং পরে পানি থেকে একজন সুদর্শন যুবক উঠে আসে। শিব তাকে বিবাহ উৎসবের মুকুট ও মালা তৈরি করার হুকুম করেন। তখন সেই যুবককে মালাকার বলে সম্বোধন করা হয়েছিল। সেসময় থেকেই শোলাশিল্পের সাথে জড়িত শিল্পীদের মালাকার উপাধি দেওয়া হয়। মালাকাররা বংশানুক্রমে শোলা দিয়ে বৈচিত্র্যময় টোপর, দেবদেবীর অলংকার, চালচিত্র, পূজামণ্ডপের সাজসজ্জা, মালা, গহনা, খেলনা ও গৃহসজ্জার নানা দ্রব্য তৈরি করে। সূত্রধর ও কর্মকাররা বিশ্বকর্মার উপাসক হলেও মালাকাররা শিবের উপাসক। এদের ধারণা শিবের ইচ্ছায় তাদের আবির্ভাব ঘটেছে, তাই শিবই তাদের উপাস্য দেবতা[২]।

বাংলাদেশে মালাকার সম্প্রদায়ই হলো শোলাশিল্পের প্রধান কারিগর। প্রাচীনকালে মালাকার সম্প্রদায় কাচা ফুল দিয়ে সাজসজ্জার কাজ করতেন। কিন্তু কাচা ফুল দীর্ঘস্থায়ী না হওয়ার কারণে পরবতীকালে জমিদারগণ সাজসজ্জার জন্য মালাকারদের এমন কিছু নির্বাচন করতে বলেন যা অধিক দীর্ঘস্থায়ী। এর পরেই মালাকাররা

শোলাশিল্পের আবিষ্কার ঘটায়। শোলার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের জন্যই সাজসজ্জা এবং লৌকিক আচার-অনুষ্ঠানের উপকরণ হিসেবে শোলার কাজ ক্রমশই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

ব্রহ্মবৈর্বতপুরাণ, বৃহদ্ধর্মপুরাণ, ভবদেব ভট্টের প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ গ্রন্থে শিল্পীদের যে তালিকা দেওয়া হয়েছে, সেখান থেকে সহজে তাদের স্থান অনুমান করা যায়। বৃহদ্ধর্মপুরাণ ব্রাহ্মণ ব্যতীত তৎকালীন যুগের আর সমস্ত বর্ণকে স্থান দিয়েছে শূদ্রবর্ণের পর্যায়ে। শূদ্র সংকর উপবর্ণের তিনটি উপবিভাগ রয়েছে, যে উপবিভাগে তাদের বৃত্তি ও পেশায় নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এই বিভাজনের ফলে উত্তম সংকর পর্যায়ে স্থান পেয়েছে তন্তুবায়, কর্মকার, কুম্ভকার, কাংসকার, শাঙ্খিক বা শঙ্খকার এবং মালাকার। মধ্যম সংকর পর্যায়ে তক্ষক ও চর্মকার। ব্রহ্মবৈর্বতপুরাণেও এই ধরনের বর্ণবিন্যাসের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে আবার সৎশূদ্র, অসৎশূদ্র ও অন্ত্যজ অজলচল পর্যায়ে এই তিনভাগের বর্ণবিন্যাস দেখা যায়। এইখানে সৎশূদ্র পর্যায়ে স্বর্ণকার, মালাকার, কর্মকার, শঙ্খকার, তন্তুকায় বা কুবিন্দক, কুম্ভকার, কাংসকার, সূত্রধর, চিত্রকররা স্থান পেয়েছে। অসৎশূদ্র পর্যায়ে রয়েছে স্বর্ণকার, সূত্রধর, চিত্রকর ও চর্মকার। সেখানে বলা হয়েছে ডোম, নিষাদ প্রভৃতি নিম্নবর্ণের মানুষরা গ্রামের বাইরে বাস করত। এদের জীবিকা ছিল বাঁশের তাঁত, চাঙারি প্রভৃতি নির্মাণ। সামাজিক অনুশাসনে এরাই ছিল নিম্নস্তরের মানুষ[৩]।

২. শোলার জন্ম বৃত্তান্ত ও পরিচয়

শোলাজাতীয় উদ্ভিদ দিয়ে শোলার শিল্পকর্ম তৈরি করা হয়। এক প্রকার জলজ উদ্ভিদের নাম শোলা। জল কথাটির অর্থ 'সলিল'। আর এই সলিল থেকে শোলার উৎপত্তি হয়–সলিল>সলিলা>সলা>সোলা (শোলা)[৪]। সাধারণত বেশি পানিতে আবাদ করা ধানখেত, পাটখেত, খাল-বিল, মজা পুকুর এবং জলাশয়ের তলদেশে পরগাছার মতো জন্মানো কোমল উদ্ভিদই শোলা। এর ইংরেজি নাম 'স্পঞ্জ উড', উদ্ভিদবিজ্ঞানে এর নাম Aspera Indigenous[৫]। আমাদের দেশে ইংরেজ শাসন আমলে শোলা দিয়ে নানা ধরনের বাহারি টুপি তৈরি করা হতো বলে এটাকে Hat Plantও বলা হতো[৬]। পানির উপরে শোলা গাছের পাতা ও ফুল ভেসে থাকে। পাতা দেখতে অনেকটা তেঁতুল পাতার মতো। মাগুরার শোলাশিল্পী নিমাই মালাকার জানায়, শোলাগাছ উচ্চতায় ৪-৫

ফুট এবং কাণ্ডের ব্যাস আড়াই ইঞ্চির বেশি হয় না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই শোলাগাছের গোড়া চিকন ও মাঝের অংশ মোটা হয়। তবে মাঝে মাঝে এর ব্যতিক্রমও দেখা যায়। শোলা সংগ্রহের ক্ষেত্রে পাট কাটার মতো পানির নিচ থেকে শোলা কাটা হয়।

বর্ষার শুরুতে শোলার বিজ পেকে যায়, আশ্বিন-কার্তিক মাসে এই বিজ ফেটে মাটিতে ঝরে পড়ে এবং ভেজা মাটিতে নতুন চারা গজায়। আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে পানি বাড়ার সাথে সাথে পানির নিচে শোলার কাণ্ড বেড়ে ওঠে এবং শাখা-প্রশাখা উপরে ভেসে ওঠে। ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্তিক এই তিন মাসে পরিণত শোলা বিল থেকে সংগ্রহ করা হয়। পানির নিচের অংশের শোলা দিয়ে শিল্পকর্ম তৈরি হয় আর উপরের অংশ জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। শোলা একটি কাণ্ডসর্বস্ব গাছ। কান্ডের বাইরের আবরণ মেটে রঙের এবং শেকড়ে জড়ানো আর ভেতরটা সাদা ধবধবে। শোলা দেখতে অনেকটা দুধের মতো সাদা এবং ফুলের মতো হালকা ও মোলায়েম। শ্বেত-শুভ্র ও জলজ বস্তু হওয়ায় এটি পবিত্রতার প্রতীকও বটে[৭]। বাংলাদেশে দুই ধরনের শোলা জন্মে–(ক) কাঠ শোলা, (খ) ভাত শোলা। কাঠ শোলা বেশ শক্ত। এই শোলা দিয়ে শিল্পকর্ম প্রস্তুত সম্ভব নয় বলে জানান মাগুরার শোলাশিল্পী নিমাই মালাকার। এই শোলা জেলেদের মাছ ধরার কাজে শক্ত ছিপি তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়। অন্যদিকে ভাত শোলা ফুলের মতো নরম ও মোলায়েম হওয়ায় অনেক অঞ্চলে এই শোলাকে ফুল শোলাও বলা হয়। এটা খুব নরম তাই এই শোলা দিয়ে শোলার সকল পণ্য প্রস্তুত করা হয়।

২.১ শোলা নির্মিত শিল্পকর্ম ও ব্যবহৃত উপকরণ

শোলাশিল্পের প্রধান উপকরণ বা কাচামাল হচ্ছে ভাত শোলা। শোলার শিল্প তৈরি করতে যন্ত্রপাতি প্রয়োজন হয় খুব সামান্যই। যার সাহায্যে শোলাশিল্পীরা তাদের দক্ষ হাতে সুনিপুণভাবে শিল্পকর্ম প্রস্তুত করেন। যন্ত্রপাতির মধ্যে কাত বা কাইত অন্যতম। ঢাকার শাঁখারি বাজারের শোলাশিল্পীরা এটাকে বড় চাকু বলে। এই কাত বা চাকু শোলা টুকরা করা এবং পাতলা কাপড়ের মতো পরত করতে সাহায্য করে। কাত ছাড়াও কাজের সুবিধার্থে শিল্পীরা বিভিন্ন ধরনের ধারালো চাকু ব্যবহার করে

থাকে। বিভিন্ন মাপের এইসব ধারালো চাকু পরিপক্ব সুপারি গাছের বড় ফালির উপরে বালু ছিটিয়ে ধার করা হয়।

এছাড়াও আনুষঙ্গিক উপকরণ হিসাবে প্রয়োজন–রঙিন কাগজ, বাঁশের টুকরা, পাটের দড়ি, কড সুতা, কাগজ, ঝাড়ুর শলা, পাটকাঠি, সালমা-চুমকি, পুতি, আঠা ইত্যাদি। অনেক দিন আগে তেঁতুল বীজের আঠা ব্যবহার করত মালাকার সম্প্রদায়। কিন্তু বর্তমানে ময়দা জ্বাল করে তার সাথে তুঁত মিশিয়ে আঠা প্রস্তুত করেন তারা। এছাড়াও বাজারের আইকা আঠাও ব্যবহার করেন তারা।

চিত্র-১
শোলার শিল্পকর্ম প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত ছুরি
(শিল্পী : গোপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, খড়িখালি, ঝিনাইদহ)

২.১.১ তেঁতুল বীজের আঠা প্রস্তুত প্রণালী :

তেঁতুল বীজ ভালোভাবে পরিষ্কার করে তিন দিন ধরে পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হয়। এরপর পানি থেকে তুলে ভালোভাবে শুকাতে হয় এবং আগুনে চূড়ান্তভাবে তাপ দেওয়া হয় লোহা বা মাটির পাত্রে। ভাজা বীজ ঢেঁকিতে কুটে খোসা ছাড়িয়ে নিয়ে গুঁড়ো করতে হয়। পুনরায় গুঁড়ো শাঁস এক সপ্তাহ পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হয়। এক সপ্তাহ পর পানি ছেঁকে আবার রোদে শুকাতে হয়। শুকানো হলে তা ঢাকনাযুক্ত মাটির পাত্রে মুখ বন্ধ করে রাখা হয়। এরপর প্রয়োজনমতো অল্প অল্প তেঁতুল বীজের গুঁড়ো নিয়ে পানির সাথে মিশিয়ে তা আঠা হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এই আঠা শুধু

জোড়া দেওয়ার কাজেই ব্যবহার হয় না বরং এই আঠা ব্যবহারে শোলার শিল্পকর্ম বিভিন্ন ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ থেকে রক্ষা পায়।

২.২ শোলার শিল্প সামগ্রী প্রস্তুত প্রণালি :

বাংলাদেশে সাধারণত শোলার তিন ধরনের কাজ হয়ে থাকে–

(ক) খোসা ছাড়িয়ে শোলার সাদা অংশ কেটে ফুল, পুতুল, খেলনা, মুকুট ইত্যাদি তৈরি;

(খ) খোসা ছাড়িয়ে শোলাকে পাতলা পাতলা তক্তার মতো করে জুড়ে অথবা তার উপর কাগজ লাগিয়ে কারান্ডি চিত্র আঁকা;

(গ) শোলার পাতলা অংশের উপর পোড়া মাটির ছাঁচ দিয়ে অ্যামবোস করা।

এই গবেষণাটি করতে গিয়ে দেশের বিভিন্ন জেলা ঘুরে শোলাশিল্পের করণকৌশল সম্পর্কে অনেক কিছু জানা গেছে। শোলাশিল্পীদের সাক্ষাৎকারে তাদের কাছ থেকে শোলাশিল্পের করণকৌশল সম্পর্কে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। প্রথমে শোলার খোসা ছাড়িয়ে শিল্পকর্মের আকার-আকৃতি অনুসারে শোলার কাণ্ডগুলোকে বিভিন্ন মাপে কেটে নেওয়া হয়। এরপর শোলার কাটা অংশ থেকে লোহার ধারালো ছুরি বা কাত দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে শোলা থেকে কাপড়ের মতো পাতলা অংশ বা কাপ তুলে নিতে হয়। এই কাপ দিয়ে নানা ধরনের শিল্পকর্ম প্রস্তুত করা সম্ভব।

চিত্র-২
শোলার ফুল তৈরির প্রক্রিয়া
(শিল্পী : গোপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, খড়িখালি, ঝিনাইদহ)

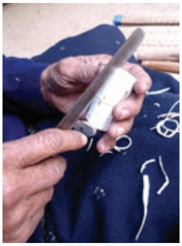

চিত্র-৩
শোলার ফুল তৈরির প্রক্রিয়া
(শিল্পী : গোপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, খড়িখালি, ঝিনাইদহ)

ঝিনাইদহের গোপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এই কাপ দিয়ে ফুল তৈরি করে দেখালেন। এই ফুল গৃহসজ্জাসহ নারীর সাজসজ্জায় বেশ জনপ্রিয়। পাতলা করে কাটা প্যাঁচানো শোলার কাপ জড়িয়ে জড়িয়ে পুনরায় কাণ্ডের মতো করে মাঝে সুতা দিয়ে বেঁধে দুটি অংশ সরু করে কেটে নেওয়া হয়। সুতা দিয়ে বাঁধা অংশটি খুলে ঐ একই জায়গায় কয়েক পরত কড সুতা জড়িয়ে সুতার এক প্রান্ত ডান হাত ও এক প্রান্ত ডান পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে চেপে ধরে (মাঝখানে থাকে প্যাঁচানো কাপ বাঁধা) খুব সজোরে টেনে ফুটিয়ে তোলা হয় শোলার কদম ফুল।

চিত্র-৪
শোলার ফুল তৈরির প্রক্রিয়া
শিল্পী : গোপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, খড়িখালি, ঝিনাইদহ

চিত্র-৫
শোলার ফুল তৈরির প্রক্রিয়া
শিল্পী : গোপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, খড়িখালি, ঝিনাইদহ

এই প্রক্রিয়ায় ফুল তৈরি করলে খুব শক্তি বা ব্যালেন্স প্রয়োজন হয়। মাগুরার শালিখার শংকর মালাকার ঘরের খোলা বারান্দার বাঁশের সাথে সুতার এক প্রান্ত বেঁধে অপর প্রান্ত হাতে ধরে সজোরে টেনে ফুল তৈরি করে। এই প্রক্রিয়ার ফুল তৈরি সহজ ও খুব বেশি শক্তিরও প্রয়োজন হয় না। এই প্রক্রিয়ায় কদম ফুল ছাড়াও আরও বিভিন্ন ধরনের ফুল তৈরি করা যায়।

২.৩ শোলা শিল্পের রং ও নকশার বিশ্লেষণ

বিখ্যাত শিল্পী Henry Matis বলেছেন, “If drawing if of the spirit and colour of the senses, you must draw first, to cultivate the spirit and to be able to lead colour into spiritual paths.”[৮]

অতএব বলা যায়, বাস্তব গঠনকে স্পষ্ট করে তোলার জন্যই শিল্পী রং ব্যবহার করেন। মূলত রং দেখতে গিয়েই আমরা গঠনকে দেখি। তাই রং-ই হলো শিল্পের প্রাণ। রং ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রায় সব এলাকার লোকশিল্পীরাই উজ্জ্বল রং ব্যবহার করতেন। শুধু শোলার শিল্পকর্মে উজ্জ্বল রং ব্যবহার করা হয় ব্যাপারটা তা নয়। লোকশিল্পের সকল ক্ষেত্রেই উজ্জ্বল রঙের প্রধান্য বেশি।

চিত্র-৬
শোলার কাকাতুয়া
(শিল্পী : দেবদাস মালাকার, শিল্পীর নিজস্ব সংরক্ষণ)

উজ্জ্বল ও চোখ ধাঁধানো রং ব্যবহারের ফলে লোকশিল্প খুব সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে। যদিও প্রাচীন যুগে অনেক শিল্পকর্মেই রং ব্যবহার করা হতো না। সাদা হচ্ছে শুভ্রতার প্রতীক। তাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শোলার শিল্পকর্মে শোলার নিজস্ব সাদা রংকেই প্রধান্য দেওয়া হয়। যেমন—দেবীর সাজসজ্জা, টোপর, কপালী, কদম ফুল, ময়ূর ইত্যাদি শোলার শিল্পীকর্ম শিল্পীরা শোলার নিজস্ব সাদা রং রেখেই প্রস্তুত করেন।

শোলা শিল্পে গোলাপী, সবুজ ও হলুদ রঙের ব্যবহারও বেশ লক্ষ করা যায়। নীল রঙের ব্যবহার হঠাৎ হঠাৎ দেখা যায়। শুকানো শোলার রং এর জলীয় অংশ তাৎক্ষণিকভাবে শুকিয়ে যাওয়ার ফলে একটা পেলব রঙের আমেজ সৃষ্টি হয় (Soft tonality of extraordinary Character)। রঙের লালিত্য আর নমনীয়তা এ শিল্পের প্রধান আকর্ষণ।

প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী রঙের উপকরণগুলো হলো—দোয়াতের কালি (লাল, নীল, কালো, সবুজ), আলতা, সিম পাতার রস, কুমড়ো ফুলের রস, কাচা হলুদ, ভূষাকালি,

চকপাউডার, তেঁতুল বিচির আঠা, সাগুর আঠা ইত্যাদি। রং ব্যবহারের জন্য ছাগলের লোম বা পাটের আঁশ কাঠির সাথে বেঁধে তুলি প্রস্তুত করা হতো। তবে শোলার শিল্পকর্মে সাধারণত পাউডার-রং ব্যবহার করা হয়। পানিতে গুলানো পাউডার রঙে শিল্পকর্মগুলো প্রয়োজনমতো ডুবিয়ে রং করা হয়।

২.৩.১ নকশা :

যে কোনো শিল্পকে অলংকরণের উদ্দেশে নকশা আরওপিত হয়। নকশায় নানা রকম মোটিফ ব্যবহার হয়ে থাকে। কখনো জ্যামিতিক, কখনো ফুল-লতাপাতা, কখনো জীবন যাপনের উপাদানসমূহ। কখনো-বা প্রাকৃতিক উপাদান আবার কখনো ছন্দময়তায় ভরপুর গতিশীল রেখা দ্বারা সৃষ্ট। দেশ, সংস্কৃতি, ধর্ম, স্থান, কাল ভেদে নকশার উপাদানে আসে ভিন্নতা, তেমনি বাংলাদেশের লোকশিল্পের অন্তর্গত শোলাশিল্পে ব্যবহৃত নকশায়ও রয়েছে স্বকীয়তা ও বৈচিত্র্যময়তা।

চিত্র-৭
ঘোড়ার গাড়ি
(শিল্পী : গোপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, খড়িখালি, ঝিনাইদহ)

শোলাশিল্প ক্ষুদ্র এবং বিশেষ একটি সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ আছে বলে এ শিল্প সম্পূর্ণভাবে অন্য দেশের প্রভাবমুক্ত। আর এ কারণেই এই শিল্পের নকশা ও মোটিফগুলোর মৌলিকত্ব ও সরলতা আজও টিকে আছে। বিভিন্নভাবে শোলার শিল্পকর্মে নকশা ব্যবহার করা হয়। রং দিয়ে নকশা করা হয়ে থাকে। শোলা কেটে কেটে নকশা তৈরি হয়ে থাকে। ছাঁচ দিয়েও নকশা করা হয়। শোলার পাতলা পরত বা কাপ ছাঁচের উপর ফেলে নকশার ছাপ তুলে নেওয়া হয়। এক্ষেত্রে কলকা, ফুল-

লতাপাতা প্রধান্য বেশি পায়। ছাঁচ থেকে ছাপ তোলার পর শোলাশিল্পী খুবই পাতলা ও নমনীয় চাকু দিয়ে ছাপ তোলা নকশা খোদাই করে বের করেন।

শোলাশিল্পকর্মে লতার ব্যবহার অধিক লক্ষণীয়। নানা রকম লতা ও ফুলের ব্যবহার হয়ে থাকে এই শিল্পে। বাংলার মসজিদে, মন্দিরে, আলপনায়, নকশিকাঁথায়, সরা ও শখের হাঁড়ির গায়ে ব্যবহৃত ফুল-লতাপাতা দিয়ে যে অলংকরণ করা হয় শোলার শিল্পকর্মেও সেই ফুল-লতাপাতার ব্যবহার হয়, অপরদিকে প্রতিমা সাজাতেও এই লতার ছড়াছড়ি যেমন–'পদ্মলতা', 'কলমীলতা', 'শুষনীলতা', 'চন্দ্রলতা', 'শঙ্খলতা'[৯], এছাড়াও পশুপাখি আর জ্যামিতিক নকশার সমন্বয়ে শোলাশিল্পীরা তাদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আর দক্ষ কৌশলের মাধ্যমে শোলাশিল্পকে করে তুলেছেন অপরূপ সুন্দর ও একান্ত স্বকীয়।

চিত্র-৮
প্রতিমার মুখ
(শিল্পী : তপন কুমার মালাকার, আত্রাই, নওগাঁ)

৩.১ শোলাশিল্পের বিকাশ ও ঐতিহ্য সন্ধান

লোকশিল্পের ঐতিহ্য বা Tradition বাংলাদেশের বিশাল একটা স্থান জুড়ে রয়েছে। ঐতিহ্যের আভিধানিক অর্থ বলতে আমরা বুঝি ইতিহাস পরম্পরাগত কথা[১০]। বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্পের মধ্যে শোলাশিল্প প্রাচীন ও উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানে মানুষের আবেগকে দোলা দিয়ে আসছে এই শিল্প। "অতীতকে দীর্ঘ সময়ের জন্য ধারণ করতে সক্ষম বলে এই সমাজে শিল্পীদের তৈরি শিল্প

ঐতিহ্যবাহী”[১১]। তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে সব লোকশিল্প কম বেশি ঐতিহ্যবাহী তবে সব ঐতিহ্যবাহী শিল্প লোকশিল্প নয়। এ বিষয়ে অজিত কুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন–“Folk art is always traditional but all traditional arts are not Folk art”[১২]। বিভিন্ন দেশের লোকশিল্পী বিভিন্ন রকম আর তাই কোনো দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সন্ধান পাওয়া যায় ঐ দেশের লোকশিল্প দেখে।

যেহেতু ঐতিহ্যের আভিধানিক অর্থ ইতিহাস পরম্পরাগত কথা, তাই বলা যায় ইতিহাস ও ঐতিহ্যের মধ্যে সম্পর্ক নিবিড়। এরই ধারাবাহিকতায় আমরা বলতে পারি, মালাকার সম্প্রাদায় তাদের নিজস্ব চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রাকৃতিক, পারিবারিক ও সামাজিকভাবে বংশপরম্পরাগত যে পেশা থেকে এ সমস্ত শিল্পপণ্য উৎপাদন করে তা নিঃসন্দেহে ঐতিহ্য-নির্ভর।

বাংলাদেশের লোকশিল্পের ভুবনে শোলাশিল্প আবহমানকাল ধরে তার ঐতিহ্যের জন্য প্রসিদ্ধ। এদেশে শোলাশিল্পের রয়েছে বিচিত্র এক জগৎ। বর্তমানে শোলাশিল্পের অবস্থান চোখে পড়ার মতো। প্রাচীন কাল থেকেই এদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মালাকার শ্রেণি অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার জন্য নিজেদের পারিবারিক, সামাজিক ও ধর্মীয় প্রয়োজন থেকেই নিজের মনের অনুপ্রেরণায় শোলার শিল্পকর্ম তৈরি করতেন। ধীরে ধীরে তা পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়ে আকর্ষণীয় রূপ লাভ করছে।

অতীতে বিশেষ করে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এর ব্যবহার লক্ষ করা যেত, কিন্তু বর্তমানে শোলাশিল্প এতটাই বিকাশ লাভ করেছে যে, ধর্মীয় অনুষ্ঠান ছাড়াও সামাজিক, রাজনৈতিক ও জাতীয় এমনকি গৃহসজ্জাসহ শিশু খেলনা হিসেবেও স্থান দখল করে নিচ্ছে। খেলনা হিসেবে শোলার তৈরি বানর, শোলার কুমির বেশ জনপ্রিয় ও পরিচিত। তবে শোলার শৌখিন পণ্য ও উপহার সামগ্রী তৈরি করতে পারলে এই শিল্প আরও বিকাশ লাভ করবে এবং এর বাণিজ্যিক দিকও প্রসারিত হবে।

এ প্রসঙ্গে শংকর মালাকার জানান, শোলাশিল্পের সবচেয়ে ঐতিহ্যবাহী শিল্পকর্ম হচ্ছে ‘টোপর’। বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের ব্যবহৃত একপ্রকার ধর্মীয় মস্তকাবরণী। সাধারণত বিবাহ উপলক্ষ্যে বরকে টোপর পরতে হয়। বিবাহ উপলক্ষ্যে টোপর পরিধান একটি প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী প্রথা। হিন্দু বিশ্বাস অনুযায়ী টোপর সৌভাগ্য এনে দেয়। কনের

বাড়ি থেকে টোপর পাঠানো হয় বরের বাড়িতে। টোপর নিয়ে হিন্দু পুরাণে যে কাহিনি আছে তা ইতোমধ্যে আমরা শোলাশিল্পের আদিকথার মধ্যে বর্ণনা করেছি। বিবাহ অনুষ্ঠানে টোপর শুধু তার সৌন্দর্যের কারণেই পরা হয় না বরং টোপর পরিধানের বিশেষ ধর্মীয় তাৎপর্য রয়েছে এবং তা পরা বরের আবশ্যিক কর্তব্য বলে বিবেচিত হয়। এই কারণে টোপর নিয়ে হিন্দু সমাজে নানাবিধ সংস্কারও রয়েছে। টোপর খুব সাবধানে ব্যবহার করা হয়। টোপর ভেঙে যাওয়া বা পুড়ে যাওয়া দুর্ভাগ্যের লক্ষণ বলে ধরা হয়[১৩]।

চিত্র-৯
টোপর ও কপালী
(শিল্পী : শংকর সরকার, শাঁখারি বাজার, ঢাকা)

টোপর বা শোলা নির্মিত যে কোনো সামগ্রী নষ্ট হয়ে গেলে তাকে জলাশয়ের গর্ভে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। লোকবিশ্বাস, এতে ভাঙা জিনিসটি নিয়ে কেউ ব্যবহারকারীর ক্ষতি করতে পারে না[১৪]।

বিবাহ ছাড়াও অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠানেও টোপরের প্রচলন রয়েছে। অন্নপ্রাশন উপলক্ষ্যে শিশুকে বরের সাজে সাজানো হয়। এবং বরের মতো তার মাথায় টোপর পরানো হয়। এই টোপর শোলার নির্মিত হলেও স্বাভাবিক কারণেই বিবাহের টোপরের তুলনায় আকারে ছোট হয়।

প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত টোপর নির্মাণে শোলা ব্যবহৃত হয়ে আসছে। শোলা নির্মিত টোপর দেখতে ধবধবে সাদা কিন্তু বর্তমানে যুগের চাহিদা অনুযায়ী টোপরে শোলার সাথে জরি, চুমকি, পাথর, পুতি ইত্যাদি যুক্ত করা হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে শোলার টোপর নানা রঙে রাঙানোও হয়।

৩.২ শোলাশিল্পের সৌন্দর্য ও নান্দনিকতা

শোলাশিল্পের সৌন্দর্য ও নান্দনিকতা আলোচনা করার পূর্বে 'শিল্প' সম্পর্কে আলোচনা করা দরকার। শিল্প বিষয়টি এতটাই ব্যাপক যে তাকে দু-এক কথায় সংজ্ঞায়িত করা কষ্টসাধ্য। হাজার বছরের শিল্পের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় আদিমকাল থেকেই শিল্পের চর্চা হয়ে এসেছে এবং ক্রমান্বয়ে বিশ্বময় শিল্পসমৃদ্ধ হয়েছে যুগ যুগ ধরে। শুধু তাই নয় সভ্যতাকেও সমৃদ্ধ হতে সহায়তা করেছে। তাই বলা যায় যে সভ্যতার ইতিহাস আর শিল্পের ইতিহাস সমার্থক। সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের মতে, "শিল্পের সংজ্ঞা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। এর সীমানা সতত পরিবর্তনশীল, বিশাল।" তিনি আরও বলেছেন, "যাকে সংজ্ঞায়িত করা যায় না তাকে সংজ্ঞায়িত করার নিরর্থক একটা প্রচেষ্টা চলে নন্দন তত্ত্বে[১৫]। লংগিনাস বলেছেন, "শিল্প হচ্ছে শিল্পীর আত্মার গভীর ধ্যান-ধারণার প্রতিচ্ছবি।" আবার গ্রিক দার্শনিক প্লেটো শিল্পকে আখ্যা দিয়েছেন "অনুকরণের অনুকরণ" হিসেবে। রবীন্দ্রনাথ শিল্পের ক্ষেত্রে "কল্পনাকেই প্রধান্য দিয়েছেন। কল্পনার ছোঁয়া পেয়েই আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সাধারণ ঘটনা অসাধারণ হয়ে ওঠে। শিল্প সুন্দর হয় তখনই যখন শিল্পের ট্রুথ বহিঃজগৎকে ছেড়ে শিল্পীর প্রকাশভঙ্গিকে আশ্রয় করে, তথ্যকে ছেড়ে রূপকে আশ্রয় করে, প্রকাশভঙ্গী যখন রমণীয় হয়ে ওঠে শিল্পীর সহজ লীলায়[১৬]। শিল্পের স্বরূপ সম্পর্কে হাবার্ড রিড তার *Meaning of Art* গ্রন্থে বলেছেন, শিল্প হচ্ছে "কিছু আনন্দদায়ক আঙ্গিক নির্মাণের প্রচেষ্টা। অন্যদিকে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলতে চেয়েছেন, শিল্প হচ্ছে "জড় ধর্মের অতিরিক্ত ধর্ম, যার যোগ মানুষের আত্মার সঙ্গে।"

দর্শনের যে শাখাটি শিল্প নিয়ে আলোচনা করে বা শিল্পের তাত্ত্বিক বিষয় নিয়ে বিশ্লেষণ করে তাকেই নন্দনতত্ত্ব বলা যেতে পারে। নন্দন অর্থ সৌন্দর্য। তবে সৌন্দর্য বিষয়টি কী, কাকে, সৌন্দর্য বলা হবে কিংবা সৌন্দর্যের স্বরূপই-বা কী, এ বিষয়ে সরাসরি কোনো উত্তর দেওয়া দুরূহ ব্যাপার। শিল্পী আব্দুস সাত্তার প্রকৃত শিল্পের স্বরূপ সন্ধান গ্রন্থে সুন্দর বিষয়টিকে বাতাসের সাথে তুলনা করেছেন। "বাতাস যেমন–দেখা যায় না, অনুভব করা যায়। সুন্দরও তেমন অনুভবের বিষয়।"[১৭] প্লেটো তাঁর 'সিম্পোজিয়াম' গ্রন্থে সৌন্দর্যের সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। তিনি বলেছেন, লিও

বাতিস্তা আলবের্তি'র মতে, "সৌন্দর্য হচ্ছে এক ধরনের ছন্দময় সমগ্র বিন্যাস, যার একটি উপাদানও পরিবর্তিত হলে তা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।"

আচার্য সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত তাঁর 'সৌন্দর্যতত্ত্ব' গ্রন্থটি শুরু করেছেন সুন্দরের ব্যাখ্যা ও কিছু সংজ্ঞা দিয়ে। তিনি বলেছেন, "সৌন্দর্য একটি বিশেষ সামঞ্জস্য বা পরিচয়ের বোধ। বিশ্লেষত্মক এবং বিশিষ্ট বোধ বলিয়া ইহার স্বরূপ লক্ষ্মণ সম্ভব নহে।"[১৮]

আমরা যখন ব্যতিক্রমী কিছু দেখি বা সুন্দর কোনো কিছু আমাদের সামনে উপস্থিত হয় তখন নিঃসন্দেহে আমাদের সাধারণ অনুভূতির বাইরে এক ধরনের উচ্চাঙ্গের ভাব তৈরি হয়–এই যে ভাব, তার সাথে নন্দনতত্ত্ব বা নান্দনিকতার সম্পর্ক। এই দুইয়ের সম্মিলিত রূপই সৌন্দর্য। নান্দনিকতা শুধু আমাদের কাছে শিল্পের গুণাবলিই তুলে ধরে না কিংবা শিল্প-সম্পর্কিত দার্শনিক সত্যই তুলে ধরে না, পাশাপাশি শিল্পকে উপভোগ করার একটি প্রশস্ত পথেও আমাদের প্রবেশ করিয়ে দেয়। অলংকরণ বা শিল্পকলার উদ্দেশ্য হচ্ছে সুন্দর ও মনোহর কিছু সৃষ্টি করা। এজন্য মনোহর বা নান্দনিক বোধই হলো শিল্পবোধ বা (Asthetic Sense)[১৯]।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে, শোলাশিল্প অত্যন্ত নান্দনিক একটি লোকশিল্প। টোপর, কপালী, পাখা, মনসার মেড়, লক্ষ্মীর ছাতা, জোড়া পাখি, কুমির, বানর, ময়ূর, চান্দা, ঘোড়া, মুখোশ, মহরমের ছেরাশির্ণী প্রতিটি শোলার শিল্পকর্ম নান্দনিক গুণে গুণান্বিত। একেবারে শোলার নিজস্ব সাদা রঙের সাদাসিধে কাজেও শোলাশিল্পীদের নান্দনিক রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। সাদার উপর সাদা শোলা দিয়ে নকশা করেন শোলাশিল্পীরা। কখনো-বা নষ্ট হয়ে যাওয়া লালচে শোলাও কাজে লাগায় নকশার ক্ষেত্রে। তাদের সহজ সরলী নকশা, কাঠামোগত দিক থেকে সরলীকরণ, উজ্জ্বল মৌলিক রঙের ব্যবহার সবকিছুই শোলাশিল্পীদের নান্দনিক রুচির পরিচয় বহন করেন।

৪. সুপারিশমালা :

১) বাংলাদেশে শোলার চাষ হয় না। তাই শোলার দুষ্প্রাপ্যতা রোধে কারিগরদের শোলা চাষে উৎসাহ প্রদানের ব্যবস্থা নেওয়া।

২) বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের অধীনে বিভিন্ন গ্রাম/কারুপল্লিতে শোলাশিল্পীদের স্থায়ী স্টল বরাদ্দ দেওয়া;
২.১. শোলাশিল্পীদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা;
২.২. তরুণ প্রজন্মকে এই পেশায় আগ্রহী করে তোলার জন্য বিভিন্ন সেমিনার/সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করা;
২.৩. সরকারিভাবে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে শোলাশিল্পীদের দক্ষতা বাড়ানো।

৩) শোলার রং ও শোলার শিল্পকর্ম স্থায়ীকরণের জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে এ বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
৩.১. শোলাশিল্পের ও শিল্পীদের বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করে গবেষণার মাধ্যমে তা দূর করার উদ্যোগ নেওয়া।

৪) শোলার উৎপাদিত পণ্য বিদেশে বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে;
৪.১. শোলাশিল্পীদের দেশীয় শিল্পমেলার পাশাপাশি বিদেশে বিভিন্ন শিল্পমেলায় অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া;
৪.২. বহির্বিশ্বে শোলাশিল্পের তেমন পরিচিতি নেই। তাই এ শিল্পের প্রচার করার ব্যবস্থা করা।

৪.১ গবেষণার সীমাবদ্ধতা :

➢ শোলা নিয়ে রচিত গ্রন্থের স্বল্পতা এবং এ সম্পর্কিত তথ্যের অভাব;

➢ বিদ্যমান অর্থ স্বল্পতা;

➢ এই গবেষণার শিরোনাম "বাংলাদেশের শোলাশিল্পের নকশা ও তার ঐতিহ্য সন্ধান"-এর বিস্তৃতি সারা বাংলাদেশ হওয়ায় যেসব জায়গায় শোলার উল্লেখযোগ্য কাজ হয় সেসব জায়গা থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এ ধরনের গবেষণায় মাঠ সমীক্ষার মাধ্যমে নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করে আরও সমৃদ্ধ কাজ করার সুযোগ রয়েছে বলে এ গবেষক মনে করে।

৫. উপসংহার :

বিশ্বের প্রতিটি জাতির একটি নিজস্ব সংস্কৃতি আছে যা তার নিজস্ব পরিচয় বহন করে। বাংলাদেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর স্বশিক্ষিত প্রান্তিক জনসাধারণের ঐতিহ্যবাহী আবহমান সংস্কৃতি হলো বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতি। একটি দেশ বা জাতির লোকসমাজ পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে জীবন-যাত্রার উপযোগী যা কিছু লাভ করে তা ওই দেশ বা জাতির লোকসংস্কৃতি নামে আখ্যায়িত হয়ে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় শোলাশিল্প একান্তভাবেই আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে চলেছে।

শোলার সাজে বাংলার শিল্পীদের যে নান্দনিকতা, যে কৌশল, নয়নাভিরাম সৌন্দর্য, শিল্পচাতুর্য রয়েছে তা আধুনিক সাজসজ্জাতে নেই বললেই চলে। তবে এ কথা সত্য যে চিরকালীন লোকশিল্প কখনো বিলুপ্ত হয় না, শুধু তার রূপ পরিবর্তন হয়। নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশের লোকশিল্প। হারিয়ে যাওয়া মালাকারদের হয়তো আর খুঁজে পাওয়া যাবে না কিন্তু তারপরও মূল্যবান এই শিল্পের ঐতিহ্য ধরে রাখতে হলে এখনো যারা এ পেশায় নিয়োজিত আছেন তাদেরকে টিকিয়ে রাখার জন্য বাস্তবমুখী বিভিন্ন পরিকল্পনা ও উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। আধুনিক যুগে স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর থার্মোকল, শোলাশিল্পের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছে। কৃত্রিম শোলা এখন প্রাকৃতিক শোলার স্থান নিতে যাচ্ছে। কিন্তু প্রাকৃতিক শোলার সহজ ও বৈচিত্র্যময়ী সৌন্দর্য, রূপবিন্যাস, অলংকরণের ভিন্নতা ও সূক্ষতা এমনভাবে বাঙালির মনে গেঁথে আছে যা আজও কেউ ভোলেনি। সভ্যতার বিকাশে বিনিময় ও বাজার ব্যবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে এই শিল্পের বিকাশ ও প্রথাগত ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়নি। লোকালয় ও আচার-অনুষ্ঠান প্রথাতে পরিবর্তন আসায় এ শিল্পের প্রসার ব্যাহত হচ্ছে। লৌকিক আচার-অনুষ্ঠানভিত্তিক অনেক কারুশিল্পই মাধ্যমগত কারণে হারিয়ে গেলেও শোলার শিল্পকর্ম টিকে আছে এর উপকরণ ও নকশার বৈচিত্র্যের কারণে এবং মালাকারদের উদ্ভাবনী ক্ষমতার জোরে। মূল্যবান এই শিল্পকে টিকিয়ে রাখতে হলে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে এর বিকাশ সাধন করাও প্রয়োজন। নচেৎ এই শিল্প টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। এটি শুধু আবেগ অনুভূতির ব্যাপার নয়, এটি সভ্যতা বিকাশের প্রশ্নও বটে। বাংলাদেশের লোকশিল্পের অন্তর্গত এই শোলাশিল্প

তার ঐতিহ্যের স্বমহিমায় জেগে উঠুক। মালাকার শ্রেণির লোকশিল্পীরা অমরত্ব লাভ করুক নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের প্রকৃত নান্দনিকতার পরিচয় নিয়ে–এ কামনাই করি।

তথ্যনির্দেশ

১. তোফায়েল আহমেদ, লোকশিল্প, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮৫, পৃ : ১৭

২. এ কে এম মুজ্জাম্মিল হক, যশোরের কারুশিল্পের বাহারি দিক এবং ভবিষ্যৎ, বাংলাদেশের কারুশিল্পী ও শিল্পকর্ম, রবীন্দ্র গোপ (সম্পাদিত) সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ : ২০১৪, পৃ. ৩০৭

৩. নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), কলিকাতা : দ্বিতীয় দে'জ সংস্করণ, ১৪০২ বাংলা, পৃ : ২১১

৪. ড. প্রদ্যোত ঘোষ, বাংলার লোকশিল্প, কোলকাতা : পুস্তক বিপণি, ২০০৪, পৃ. ১৩৫

৫. নীরু শামসুন্নাহার, বাংলাদেশের শোলা-শিল্প, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর পত্রিকা, প্রকাশ চন্দ্র দাস (সম্পাদিত), ঢাকা : , প্রথম বর্ষ, ২০১৩, পৃ. ৬৪

৬. এ কে এম মুজ্জাম্মিল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৫

৭. নীরু শামসুন্নাহার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪, ৬৫

৮. ড. মো. মোস্তাফিজুর রহমান, (নকশাকলা), দিনাজপুর : মো. হাবিবুর রহমান (প্রকাশক), ২০০৮, পৃ. ২

৯. হীরেন্দ্র নাথ মিত্র (ব্রজমিত্র), বাংলার লোকউৎসব ও লোকশিল্প, কোলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ২০০৭, পৃ. ২০৪

১০. এ কে এম মুজ্জাম্মিল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৬

১১. এ কে এম মুজ্জাম্মিল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৭

১২. এ কে এম মুজ্জাম্মিল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৭-৩১৮

১৩. সাক্ষাৎকার : শংকর মালাকার (মাগুরা, শালিখা, ২০১৬)

১৪. সাক্ষাৎকার : শংকর সরকার (শাঁখারি বাজার, ঢাকা, ২০১৬)

১৫. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, নন্দনতত্ত্ব, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮৮, পৃ. ৪৫

১৬. সুধীর কুমার নন্দী, নন্দনতত্ত্ব, পৃ. ৩৯

১৭. ড. আবদুস সাত্তার, প্রকৃত শিল্পের স্বরূপ সন্ধান, ঢাকা : বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ১৪১০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৩

১৮. কামাল আহমদ, শিল্পকলার ইতিহাস, পৃ. ৩

১৯. ড. মো. মোস্তাফিজুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২

২০. মতলুব আলী, শিল্পী ও শিল্পকলা, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৪

২১. সৈয়দ আলী আহসান, শিল্প বোধ ও শিল্প চৈতন্য, ঢাকা : বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৯৩

২২. শাহরিয়ার হোসেন শাবিন, বাংলাদেশের লোকজ খেলনা, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১০

২৩. গোপাল হালদার, বাঙালির সংস্কৃতির রূপান্তর, প্রকাশক : মুক্তধারা, ঢাকা

২৪. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, বাংলাদেশের লোকশিল্প, ঢাকা : বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন, ১৯৮৩

২৫. নিসার হোসেন, লোকচিত্র কলা, চারু ও কারুকলা, লালা রুখ সেলিম (সম্পাদিত) ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭

২৬. সাক্ষাৎকার : নিমাই মালাকার (মাগুরা, শালিখা, ২০১৬)

২৭. সাক্ষাৎকার : নিশা রানী মালাকার (মাগুরা, শালিখা, ২০১৬)